কালের কণ্ঠ

27 DEC 2017
তারিখ ....
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ১

দুর্নীতি ও সমন্বয়হীনতা স্নাতক উপবৃত্তি প্রকল্পে

■ সাব্বির নেওয়াজ

কুড়িগ্রামের রাজারহাট উপজেলার 'দুর্গম বিদ্যানগর চরের হতদরিদ্র পরিবারের কন্যাসন্তান হেলেনা খাতুনের এসএসসি ও এইচএসসি পাস করার পেছনে সরকারি উপবৃত্তির বড় ভূমিকা রয়েছে। হেলেন বলেন, উপবৃত্তির টাকা না পেলে তিনি এতদূর আসতে পারতেন না। রংপুরের কাউনিয়া ডিগ্রি কলেজে ভর্তি হয়ে প্রথম বর্ষে ৪৯০০ টাকা পেলেও পরের বছর আর পাননি।

শুধু হেলেন নয়, একই কলেজের শিউলী খাতুন, রেখা রানী, শামীম মিয়াসহ ৬০ শিক্ষার্থীর উপবৃত্তির টাকা না পাওয়ার কারণ অস্পষ্ট। তাদের শিক্ষাজীবন হুমকির মুখে। এই উপবৃত্তির প্রকল্প শেষ হলেও সরকারি অর্থে তা চালু রয়েছে। প্রকল্প শেষে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের (আইএমইডি) একটি প্রতিবেদনে উঠে এসেছে স্নাতক উপবৃত্তি নিয়ে দুর্নীতি, গাফিলতি ও অব্যবস্থার চিত্র।

আইএমইডি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, উপবৃত্তির জন্য চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত হলেও অসংখ্য শিক্ষার্থী উপবৃত্তির টাকা পাননি। কেউ কেউ প্রথম কিস্তির টাকা পেলেও পরের কিস্তির টাকা পাননি। প্রতিবেদনটি তৈরি করতে রংপুর, লালমনিরহাট, সিলেট ও সুনামগঞ্জ জেলার আটটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করেন আইএমইডির কর্মকর্তারা। এর মধ্যে রংপুরের কাউনিয়া ডিগ্রি কলেজ, লালমনিরহাট সরকারি কলেজ, লালমনিরহাট নেছারিয়া কামিল মাদ্রাসা, লালমনিরহাট আদর্শ ডিগ্রি কলেজের মোট ১২৩ শিক্ষার্থী উপবৃত্তির জন্য বরাদ্দ করা টাকা পাননি। একজন শিক্ষার্থীর জন্য বছরে ৪৯০০ টাকা বরাদ্দ। এ হারে এসব শিক্ষার্থীর তিন বছরে মোট ১৮ লাখ ৮ হাজার ১০০ টাকার অনিয়ম ঘটেছে।

অনেকের শিক্ষাজীবন হুমকির মুখে

সারাদেশের এক হাজার ১৮১টি ডিগ্রি কলেজ ও এক হাজার ৫৪টি ফাজিল মাদ্রাসায় স্নাতক উপবৃত্তির টাকা বিতরণে ভয়ঙ্কর দুর্নীতি হয়েছে বলে প্রতিবেদনে মন্তব্য করা হয়েছে।

জানতে চাইলে রংপুর কাউনিয়া ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষ মুসা আহমেদ স্বীকার করেন, তার কলেজের ৬০ শিক্ষার্থী উপবৃত্তির জন্য নির্বাচিত হলেও টাকা পায়নি। তিনি আশঙ্কা করেন, কোনো একটি চক্র শিক্ষার্থীদের টাকা লুট করেছে। তিনি জানান, আগে সরকারি ব্যাংকের মাধ্যমে উপবৃত্তির টাকা দেওয়া হতো। কর্মকর্তারা কলেজে এসে শিক্ষার্থীদের টাকা দিয়ে যেতেন।

আইএমইডির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, উপবৃত্তির টাকা বিতরণে শিক্ষার্থী, প্রতিষ্ঠান প্রধান, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস, বিতরণকারী প্রতিষ্ঠান ডাচ্‌বাংলা ব্যাংক ও প্রকল্প কর্মকর্তাদের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব ছিল। উপজেলা বা কলেজভিত্তিক বিতরণকৃত টাকা ও শিক্ষার্থীর সংখ্যার তথ্য দিতে পারেনি ব্যাংক কর্তৃপক্ষ। উপবৃত্তি পাওয়ার শর্ত ভঙ্গ অর্থাৎ শ্রেণিকক্ষে উপস্থিতির হার কম, ড্রপ আউট, বিয়ে হলে তাদের বাদ দিয়ে নতুন শিক্ষার্থী নির্ধারণ করার বিষয়গুলো ছিল জটিল ও সময়সাপেক্ষ।

শিক্ষার্থীর উপবৃত্তির টাকা মোবাইলের মাধ্যমে তোলার তথ্য 'হ্যাক' করার গুরুতর অভিযোগের বিষয়টিও তুলে ধরা হয়েছে প্রতিবেদনে।

প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, প্রকল্প প্রস্তাব অনুযায়ী ১১ কর্মকর্তা-কর্মচারীর ভাতা বাবদ ৪৯ লাখ ১৬ টাকা থোক বরাদ্দের বিপরীতে ৫৩ লাখ ছয় হাজার টাকা খরচ করা হয়েছে। এ ছাড়া ওয়ার্কশপ, উপবৃত্তির আবেদন ফরম ও লিফলেট ছাপা, ডাটা এন্ট্রি অ্যান্ড প্রসেসিং, আউট সোর্সিং কর্মচারীদের বেতন, অফিস যন্ত্রপাতি, কম্পিউটার, ল্যাপটপসহ অন্যান্য সরঞ্জাম কিনতে ব্যাপক অনিয়ম-দুর্নীতি হয়েছে।

উপবৃত্তিবঞ্চিত শিক্ষার্থীদের প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট থেকে টাকা দেওয়ার প্রস্তাব করে প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ভবিষ্যতে উপবৃত্তির টাকা বিতরণের সঙ্গে জড়িতের সমন্বয় জোরদার করা, কারিগরি ত্রুটি সমাধান, উপবৃত্তি বিতরণে ব্যাংকের হেল্প ডেস্ক চালু করা এবং বৃত্তির সুফল নিয়ে প্রতিবেদন তৈরি করা প্রয়োজন।

প্রকল্পের পুরো মেয়াদে পরিচালকের দায়িত্ব পালনকারী অধ্যাপক সৈয়দ মো. মোজ্জাম্মেল হক বর্তমানে মাধ্যমিক ও ■ পৃষ্ঠা ১৩ : কলাম ৬

দুর্নীতি ও সমন্বয়হীনতা

[তৃতীয় পৃষ্ঠার পর]

উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরে (মাউশি) ওএসডি আছেন। প্রকল্পের দুর্নীতির বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি সব অভিযোগ অস্বীকার করে সমকালকে বলেন, 'শিক্ষার্থীরা উপবৃত্তির টাকা পায়নি এমন কোনো তথ্য তার কাছে নেই। কেউ অভিযোগও করেনি। পরীক্ষায় খারাপ ফল ও ক্লাসে অনুপস্থিতির কারণে হয়তো কোনো শিক্ষার্থী বাদ গেছে।'

তিনি বলেন, টাকা প্রকল্প থেকে তারা দিতেন ডাচ্-বাংলা ব্যাংককে। ব্যাংক তা স্থানীয় উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসারের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানে ম্যানুয়ালি বিতরণ করত।

তিনি বলেন, 'ডাচ্ বাংলা ব্যাংক কোনো অনিয়ম করেনি। ব্যাংক জমা থাকা টাকা আমাদের ফেরত দিয়েছে। আমরা প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টে তা জমা দিয়েছি।'

অধ্যাপক সৈয়দ মোজ্জাম্মেল হক আরও বলেন, আইএমইডির প্রতিবেদনের কথা তিনি শুনেছেন। তবে তার সঙ্গে কোনো যোগাযোগ না করেই এ প্রতিবেদন তৈরি করা হয়েছে। তিনি প্রকল্পের দায়িত্বে থাকার সময় এমন কোনো অভিযোগ কখনও পাননি বলে জানান।

হঠাৎ অজ্ঞাত কারণে উপবৃত্তির টাকা না পাওয়ায় হেলেন কীভাবে লেখাপড়া চালাচ্ছেন? তিনি জানান, ২৫০ টাকা মাসিক সুদে পাঁচ হাজার টাকা ব্যক্তিগত ঋণ নিয়ে তিনি পরীক্ষার ফরম পূরণ করেছেন। সেই ঋণ এখনও শোধ করতে পারেননি।

তিনি জানান, প্রায় এক ঘণ্টা হাঁটার পর ৫০ টাকা অটোরিকশা ভাড়া দিয়ে কলেজে যেতে-আসতে হয়। টাকার অভাবে এখন কলেজেও যেতে পারছেন না। দরিদ্র পিতার পক্ষে তার খরচ বহন করা সম্ভব হচ্ছে না। উপবৃত্তির টাকা না পেলে তার ডিগ্রি পাস করা সম্ভব হবে না।

স্নাতক পর্যায়ে শিক্ষার্থী ভর্তির হার বৃদ্ধি, চাকরির সুযোগ ও উপার্জন ক্ষমতা বাড়ানো, ছোট পরিবার ও জন্মহার নিয়ন্ত্রণ, দারিদ্র্য বিমোচন, জেন্ডার সমতা ও ক্ষমতায়ন অর্জন ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে সরকার স্নাতক (পাস) পর্যায়ে উপবৃত্তি প্রকল্প চালু করে। তখন ব্যয় ধরা হয় ৩৪২ কোটি ৯৬ লাখ টাকা। ২০১১ সালের জুলাই থেকে গত বছরের জুন পর্যন্ত প্রকল্পটি বাস্তবায়ন হয়। প্রকল্প শেষে বর্তমানে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টের মাধ্যমে উপবৃত্তি দেওয়া হচ্ছে।